Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-III, April 2026, Page No. 29-34
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.03W.079

মঙ্গলকাব্যের প্রেক্ষিতে লোকজ ধর্ম ও মূল্যবোধের বহুমাত্রিকতার পর্যালোচনা

নিরঞ্জন মণ্ডল, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সাঁকরাইল অনিল বিশ্বাস স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 21.04.2026; Accepted: 27.04.2026; Available online: 30.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the corpus of medieval Bengali literature, Mangal-Kavya holds a distinctive and significant position for its rich portrayal of folk religion and the moral fabric of society. The present abstract examines the multidimensional nature of folk religion and values through a cultural analysis of two prominent texts—Manasamangal and Chandimangal. These narratives not only articulate devotional practices but also illuminate the everyday realities, fears, aspirations, and ethical frameworks of common people. In Manasamangal, the rise of the worship of Goddess Manasa reflects the tension between traditional mercantile pride and emergent popular faith. The character of Chand Saudagar embodies resistance to new religious authority, while his eventual submission signifies the inevitability of divine power and the importance of adaptability in social life. Here, religion transcends ritualistic boundaries and becomes deeply embedded in the lived experiences of individuals, shaping their actions, decisions, and worldview. The text foregrounds values such as devotion, humility, and acceptance of fate, which are central to sustaining social equilibrium. Conversely, Chandimangal offers a broader representation of society by integrating religious devotion with economic activities, familial relations, and social responsibilities. Through the narrative of Kalaketu and Phullara, the text highlights how divine intervention is closely linked with human virtues like compassion, justice, and communal welfare. The goddess Chandi emerges not only as a spiritual force but also as a symbol of moral authority that guides and regulates social conduct. A comparative reading of these two Mangal-Kavyas reveals that folk religion operates as a dynamic and integrative force within society. It is not confined to spiritual devotion alone but actively influences ethical values, interpersonal relationships, and socio-economic structures. Therefore, these texts function as vital cultural documents that encapsulate the collective consciousness, belief systems, and value-oriented life of medieval Bengali folk society.

Keywords: Spiritual practice, Values, Religious belief, Worship of gods and goddesses

বাংলা মধ্যযুগীয় সাহিত্যধারায় মঙ্গলকাব্য এক গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে। এই ধারার কাব্যগুলি মূলত দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকথা অবলম্বনে রচিত হলেও এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল সমাজে নির্দিষ্ট দেবতার পূজার প্রচলন ঘটানো এবং সেই সঙ্গে লোকজ জীবনের নানা দিককে সাহিত্যিক রূপ দেওয়া।

মঙ্গলকাব্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি শাখা হলো 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল'। এই কাব্যদ্বয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান এবং সামাজিক মূল্যবোধ কীভাবে লোকজ জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল, তার এক জীবন্ত চিত্র এতে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথমত, 'মনসামঙ্গল' কাব্যে দেবী মনসার পূজা প্রতিষ্ঠার কাহিনি কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। দেবী মনসা মূলত সাপের দেবী, যিনি লোকজ সমাজে ভয় ও ভক্তির এক সম্মিলিত প্রতীক। গ্রামীণ জীবনে সাপের উপস্থিতি ছিল একটি বাস্তব ও ভীতিকর অভিজ্ঞতা, ফলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সাপের দেবীর প্রতি ভক্তি নিবেদন করত। এই কাব্যে চাঁদ সদাগরের কাহিনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি দেবী মনসার পূজা করতে অস্বীকার করেন, যার ফলে দেবীর ক্রোধে তার পরিবার ও সম্পদের ওপর একের পর এক বিপর্যয় নেমে আসে। এই ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, ধর্মীয় কর্তব্য অস্বীকার করলে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে অমঙ্গল নেমে আসতে পারে এমন একটি ধারণা লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। চাঁদ সদাগরের অবাধ্যতা এবং পরবর্তীকালে দেবীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার ঘটনাটি ধর্মীয় মূল্যবোধের এক গুরুত্বপূর্ণ দিককে তুলে ধরেছে। এখানে ধর্ম কেবল আচার নয়, বরং এক সামাজিক বাধ্যবাধকতা। দেবতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন না করলে ব্যক্তি সমাজে গ্রহণযোগ্যতা হারাতে পারে, এই ধারণা মঙ্গলকাব্যে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। একই সঙ্গে, এই কাহিনি মানুষের জীবনে নিয়তি ও ভাগ্যের ভূমিকার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। চাঁদ সদাগরের মতো এক শক্তিশালী ও ধনী ব্যক্তি পর্যন্ত দেবীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেননি, এটি মানুষের অসহায়ত্ব ও ঈশ্বর নির্ভরতার প্রতীক। 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি। বেহুলার অদম্য ভালোবাসা, ধৈর্য ও আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে নারীর আদর্শ চরিত্রের এক অনন্য উদাহরণ উপস্থাপিত হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর বেহুলা তাকে পুনর্জীবিত করার জন্য যে কঠিন যাত্রা সম্পন্ন করে, তা শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিফলন নয়, বরং পারিবারিক মূল্যবোধ, বিশেষ করে দাম্পত্য ভালোবাসা ও নিষ্ঠার প্রতীক। বেহুলার চরিত্রে আমরা দেখতে পাই, কীভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের মানসিক শক্তি ও আশা জাগিয়ে তুলেছে।

অন্যদিকে, 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক কাঠামোর একটি বিস্তৃত চিত্র ফুটে উঠেছে। কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনি এই কাব্যের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। কালকেতু একজন সাধারণ শিকারি, যে দেবী চণ্ডীর কৃপায় রাজা হয়ে উঠেছে। এই কাহিনি সমাজে ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সামাজিক উন্নতির একটি সম্পর্ক নির্দেশ করে। অর্থাৎ, দেবতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করলে ব্যক্তি জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে, এমন একটি ধারণা লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। ফুল্লরার চরিত্রের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই একজন আদর্শ গৃহিণীর প্রতিচ্ছবি, যিনি স্বামীর প্রতি অনুগত, সংসার পরিচালনায় দক্ষ এবং নৈতিক মূল্যবোধে দৃঢ়। তার চরিত্রে নারীর সামাজিক ভূমিকা ও দায়িত্ববোধের একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। একই সঙ্গে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনযাত্রা, পেশা ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যায়, যা লোকজ সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সামাজিক সংহতি ও ন্যায়বোধের প্রতিফলন। এখানে ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয় নয়, বরং সমাজে শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা রক্ষার একটি মাধ্যম। দেবী চণ্ডীর পূজা সমাজে ঐক্য সৃষ্টি করে এবং মানুষকে ন্যায় ও সত্যের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। এই কাব্যে আমরা দেখতে পাই, কীভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে একত্রিত করেছে এবং একটি সমষ্টি চেতনা গড়ে তুলেছে। বাংলা মধ্যযুগীয় সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্যধারা, যার মূল লক্ষ্য ছিল দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের মাধ্যমে সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা করা। তবে এই কাব্যগুলি কেবল ধর্মীয় প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে তৎকালীন গ্রামীণ সমাজের জীবনযাত্রা, বিশ্বাস,

আচার-অনুষ্ঠান এবং মানবিক মূল্যবোধের এক বাস্তব ও প্রাণবন্ত চিত্র। 'চণ্ডীমঙ্গল' এই ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, যেখানে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি লোকজ জীবনের গভীর অন্তর্লোক উন্মোচিত হয়েছে। এই কাব্যের কালকেতু-ফুল্লরা আখ্যান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে এক সাধারণ শিকারি থেকে আদর্শ শাসকে পরিণত হওয়া কালকেতুর জীবনের মাধ্যমে ধর্মচেতনা ও মানবিক মূল্যবোধের এক গতিশীল রূপান্তর চিত্রিত হয়েছে। প্রথমত, 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ লোকজ ধর্মচেতনার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এটি কোনো কঠোর শাস্ত্রনির্ভর বা ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মচর্চা নয়, বরং এটি অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস এবং দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। দেবী চণ্ডী এখানে কেবল দেবী নন, তিনি গ্রামীণ মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ একজন রক্ষাকর্ত্রী, দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটানো শক্তি। কালকেতু প্রথমে এই দেবী সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। সে একজন ব্যাধ, যার জীবিকা নির্ভর করে জঙ্গল ও শিকারের উপর। এই জীবনযাত্রা প্রকৃতিনির্ভর এবং লোকজ সংস্কৃতির এক আদিম স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু দেবী চণ্ডীর সঙ্গে তার পরিচয় এবং পরবর্তীকালে তার প্রতি বিশ্বাসের উদ্ভব লোকজ ধর্মবিশ্বাসের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছে, এখানে ধর্ম জন্মায় অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে নয়। দ্বিতীয়ত, কালকেতুর চরিত্রের রূপান্তর এই কাহিনির কেন্দ্রীয় বিষয়। প্রাথমিকভাবে তিনি এক সাধারণ শিকারি, কিছুটা রূঢ় এবং জীবিকার জন্য পশুহত্যায় অভ্যস্ত। কিন্তু দেবী চণ্ডীর কৃপায় তার জীবনে এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। দেবী তাকে স্বপ্নে নির্দেশ দেন এবং তার ভাগ্যের মোড় ঘুরিয়ে দেন। এই রূপান্তর ধীরে ধীরে ঘটে, প্রথমে সে দেবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তারপর তার আচরণ ও মানসিকতায় পরিবর্তন আসে, এবং পরবর্তীকালে সে একজন ন্যায়পরায়ণ ও মানবিক শাসকে পরিণত হয়। এই পরিবর্তন কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির প্রতীক নয়, এটি সমাজে ধর্মের প্রভাব এবং নৈতিকতার বিকাশের এক প্রতিফলন। তৃতীয়ত, কালকেতু চরিত্রে বিভিন্ন মানবিক মূল্যবোধের সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। সহমর্মিতা ও করুণা তার অন্যতম প্রধান গুণে পরিণত হয়েছে। প্রথম জীবনে কালকেতু পশুহত্যায় অভ্যস্ত হলেও পরবর্তীকালে তার মধ্যে জীবজন্তুর প্রতি সহানুভূতি এবং মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ জন্ম নেয়। সে উপলব্ধি করে যে জীবনের মূল্য কেবল নিজের অস্তিত্বে সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্যের কল্যাণের মধ্যেও তা নিহিত। এই উপলব্ধি তাকে এক উচ্চতর নৈতিক স্তরে উন্নীত করেছে। এছাড়া ন্যায়পরায়ণতা কালকেতুর চরিত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যখন সে রাজা হয়, তখন প্রজাদের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে। তার শাসন ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে সমাজে শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করে। এই দিকটি লোকসমাজে আদর্শ শাসকের ধারণাকে প্রতিফলিত করেছে, যেখানে শাসকের প্রধান দায়িত্ব হল প্রজাদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা। পরিশ্রম ও আত্মনির্ভরতা কালকেতুর জীবনের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই বিদ্যমান। সে কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং নিজের প্রচেষ্টায় জীবনধারণ করে। যদিও দেবীর কৃপায় তার জীবনে সমৃদ্ধি আসে, তবুও তার পরিশ্রমী মনোভাব অটুট থাকে। এই দিকটি লোকজ জীবনের একটি মৌলিক মূল্যবোধ, পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনকে তুলে ধরেছে। বিশ্বাস ও ভক্তি কালকেতুর জীবনে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। দেবী চণ্ডীর প্রতি তার অটল বিশ্বাস তাকে জীবনের বিভিন্ন সংকট অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে এবং তাকে নৈতিক পথে পরিচালিত করেছে। লোকজ ধর্মে এই বিশ্বাসই মানুষের জীবনের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। চতুর্থত, কালকেতু কাহিনিতে লোকজ সংস্কৃতির বহুমাত্রিক প্রতিফলন দেখা যায়। গ্রামীণ জীবনের চিত্র এখানে অত্যন্ত জীবন্ত। শিকার, প্রকৃতিনির্ভর জীবনযাত্রা সবকিছুই লোকজ বাস্তবতার অংশ। কালকেতুর জীবনযাত্রা এই পরিবেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, যা তাকে লোকজ সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই কাহিনি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কালকেতু ও ফুল্লরার সম্পর্ক, পারস্পরিক ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে

গড়ে উঠেছে। ফুল্লরা কেবল একজন পত্নী নয়, সে কালকেতুর জীবনে নৈতিক ও মানসিক শক্তির উৎস। তার প্রেরণা ও সমর্থন কালকেতুর জীবনের পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই সম্পর্ক লোকজ পারিবারিক জীবনের একটি আদর্শ চিত্র তুলে ধরেছে, যেখানে নারী কেবল গৃহস্থালির সীমাবদ্ধ চরিত্র নয়, বরং জীবনের সহযাত্রী। অর্থনৈতিক দিক থেকেও কালকেতুর জীবন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। তার জীবনে দারিদ্র্য থেকে সমৃদ্ধির পথে উত্তরণ লোকসমাজের অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করেছে। এটি দেখায় যে সমাজের সাধারণ মানুষও উন্নতির স্বপ্ন দেখে এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য ধর্মীয় বিশ্বাসকে একটি সহায়ক শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে। পঞ্চমত, 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ ধর্ম ও মানবিক মূল্যবোধের সমন্বয় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এখানে ধর্ম কেবল আচার-অনুষ্ঠান বা দেবতার পূজার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানুষের নৈতিক উন্নয়নের একটি মাধ্যম। কালকেতুর জীবনে দেবী চণ্ডীর প্রতি ভক্তি তাকে একজন উন্নত মানুষে পরিণত করেছে। তার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা, সহানুভূতি এবং দায়িত্ববোধের বিকাশ ঘটেছে। এই দিক থেকে 'চণ্ডীমঙ্গল' একটি নৈতিক শিক্ষামূলক গ্রন্থ হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। তবে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই কাহিনিকে বিশ্লেষণ করলে কিছু প্রশ্নও উত্থাপিত হয়। কালকেতুর জীবনের উন্নতি সম্পূর্ণরূপে দেবীর কৃপানির্ভর হিসেবে চিত্রিত হয়েছে, যা মানুষের নিজস্ব প্রচেষ্টা ও সক্ষমতার গুরুত্বকে কিছুটা আড়াল করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক যুক্তিবাদী চিন্তার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু লোকজ সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে এটি সেই সময়ের মানুষের বিশ্বাস ও মানসিকতারই প্রতিফলন, যেখানে দেবতার কৃপাকে জীবনের সাফল্যের মূল কারণ হিসেবে দেখা হত। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এই কাহিনিতে সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি অন্তর্নিহিত চিত্রও পাওয়া যায়। কালকেতু একজন নিম্নবর্গীয় শিকারি থেকে রাজা হয়ে ওঠে, যা এক ধরনের সামাজিক গতিশীলতার ইঙ্গিত দেয়। তবে এই পরিবর্তনও দেবীর কৃপা দ্বারা সম্ভব হয়েছে, যা আবার ধর্মীয় নির্ভরতার বিষয়টিকেই জোরদার করেছে। 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর কালকেতু চরিত্র লোকজ জীবনে ধর্ম ও মানবিক মূল্যবোধের এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। তার জীবনের রূপান্তর দেখায় যে ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের নৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একই সঙ্গে এই কাহিনি লোকজ সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক যেমন - গ্রামীণ জীবন, সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং মানসিকতাকে গভীরভাবে প্রতিফলিত করে। চণ্ডীমঙ্গল' কেবল একটি ধর্মীয় কাব্য নয়, এটি একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দলিল, যেখানে লোকজ জীবনের গভীর সত্য এবং মানবিক মূল্যবোধের চিরন্তন শিক্ষা নিহিত রয়েছে। কালকেতু চরিত্র এই সত্যের এক জীবন্ত প্রতীক, সে সাধারণ থেকে অসাধারণে উত্তরণের মাধ্যমে মানবজীবনের সম্ভাবনা ও নৈতিক বিকাশের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর কালকেতু-ফুল্লরা পর্বে ফুল্লরা এক সাধারণ গৃহবধূ হলেও তার চরিত্রে এক অসাধারণ মানবিক শক্তি ও ধর্মীয় নিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। সে মূলত দরিদ্র ব্যাধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার জীবন সংগ্রাম, দুঃখ-কষ্ট ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। এই চরিত্রটি লোকজ সমাজে নারীর অবস্থান, তার কর্তব্যবোধ এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। প্রথমত, ফুল্লরার চরিত্রে ধর্মীয় বিশ্বাসের গভীরতা লক্ষ্য করা যায়। সে দেবী চণ্ডীর প্রতি অগাধ আস্থা রাখে। তার জীবনের প্রতিটি দুঃসময়ে সে দেবীর শরণাপন্ন হয়েছে এবং বিশ্বাস করে যে দেবীর কৃপায় সব বাধা অতিক্রম করা সম্ভব। এই বিশ্বাস লোকজ ধর্মচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যেখানে দেবতা কেবল পূজার বিষয় নয়, বরং জীবনের সহায়ক শক্তি। ফুল্লরার এই ভক্তি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের চেয়ে বেশি ব্যক্তিগত ও অনুভূতি নির্ভর, যা লোকধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়ত, ফুল্লরার চরিত্রে মানবিক মূল্যবোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সে একজন আদর্শ স্ত্রী, যে স্বামী কালকেতুর প্রতি নিবেদিত প্রাণ। কালকেতুর দারিদ্র্য, সংগ্রাম এবং নানা বিপদের মধ্যেও ফুল্লরা কখনও তার প্রতি বিরূপ হয় না। বরং তাকে সাহস ও প্রেরণা জোগায়। তার এই সহমর্মিতা ও ত্যাগবোধ বাংলার গ্রামীণ সমাজে নারীর আদর্শ রূপকে

প্রতিফলিত করেছে। তৃতীয়ত, ফুল্লরার মধ্যে সহানুভূতি ও দয়ার মনোভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সে শুধু নিজের পরিবার নয়, আশেপাশের মানুষদের প্রতিও সহমর্মী। তার আচরণে সামাজিক সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার একটি সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। লোকজ সমাজে এই ধরনের মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে এবং সমাজকে সুসংগঠিত রাখতে সাহায্য করে। চতুর্থত, ফুল্লরার চরিত্রে সংগ্রামী মনোভাব ও ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতেও সে ভেঙে পড়ে না। দারিদ্র্য, অনিশ্চয়তা এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সে ধৈর্য ও বিশ্বাস নিয়ে জীবনযাপন করে। এই মনোভাব লোকজ জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যেখানে মানুষ প্রতিকূলতার মধ্যেও আশা হারায় না। পঞ্চমত, ফুল্লরার চরিত্রে নারীজীবনের বাস্তবতা ও সীমাবদ্ধতার একটি প্রতিফলনও দেখা যায়। সে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বসবাস করলেও তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধ রয়েছে। যদিও সে স্বামীর প্রতি অনুগত, তবুও প্রয়োজনে সে নিজের মত প্রকাশ করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে লোকজ সমাজে নারীরা সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় নয়, বরং তারা সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ষষ্ঠত, ফুল্লরার চরিত্রে ধর্ম ও মানবিকতার একটি সমন্বয় দেখা যায়। তার ধর্মীয় বিশ্বাস তাকে মানবিক হতে সাহায্য করে এবং মানবিক গুণাবলি তার ধর্মীয় চেতনা আরও গভীর করে। এই সমন্বয় লোকজ সংস্কৃতির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যেখানে ধর্ম শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এছাড়া ফুল্লরার জীবনের ঘটনাবলি থেকে বোঝা যায় যে লোকজ সমাজে ধর্ম একটি সামাজিক শক্তি হিসেবে কাজ করে। দেবীর কৃপা লাভের জন্য মানুষ সৎ জীবনযাপন, দয়া, সহানুভূতি এবং সততার মতো মূল্যবোধ অনুসরণ করে। ফুল্লরার জীবন এই ধারণার একটি প্রতীকী উদাহরণ। সবশেষে বলা যায়, চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরা চরিত্রটি শুধু একটি সাহিত্যিক চরিত্র নয়, বরং এটি বাংলার লোকজ সমাজের ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তার চরিত্রে আমরা দেখতে পাই বিশ্বাস, ভালোবাসা, ত্যাগ, সহমর্মিতা এবং সংগ্রামের এক অনন্য সমন্বয়। এই চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে মঙ্গলকাব্য কেবল ধর্মীয় কাহিনি নয়, বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ লোক-সাংস্কৃতিক দলিল, যা আমাদের সমাজের মূল্যবোধ ও জীবনদর্শনকে প্রতিফলিত করে। ফুল্লরা চরিত্রের আলোকে বলা যায় যে লোকজ জীবনে ধর্ম ও মানবিক মূল্যবোধ পরস্পর পরিপূরক এবং এই দুইয়ের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে এক সুস্থ ও সুসংগঠিত সমাজব্যবস্থা।

উভয় কাব্যের আলোচনায় একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, লোকজ জীবনে ধর্ম কেবল আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিল। কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পারিবারিক সম্পর্ক সবকিছুর সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান জড়িয়ে ছিল। মানুষ বিশ্বাস করত, দেবতার আশীর্বাদ ছাড়া জীবনে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। ফলে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন ছিল তাদের জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। এছাড়া, মঙ্গলকাব্যে প্রতিফলিত মূল্যবোধগুলির মধ্যে অন্যতম হল মানবিকতা, দায়িত্ববোধ, ভক্তি, সততা ও সহমর্মিতা। বেহুলার আত্মত্যাগ, কালকেতুর পরিশ্রম, ফুল্লরার সংসারনিষ্ঠা এই সমস্ত চরিত্র ও ঘটনাপ্রবাহ মানুষের জীবনে নৈতিক আদর্শ স্থাপন করে। এই কাব্যগুলি লোকসমাজে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করত এবং মানুষকে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করত। লোকসাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মঙ্গলকাব্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এগুলি কেবল সাহিত্য নয়, বরং একটি সমাজের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দলিল। এখানে লোকবিশ্বাস, লোকাচার, উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক সম্পর্ক সবকিছুর একটি সমন্বিত চিত্র পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, মধ্যযুগীয় বাংলার মানুষ কীভাবে তাদের জীবনকে ধর্মীয় বিশ্বাসের আলোকে ব্যাখ্যা করত এবং সেই বিশ্বাস তাদের আচরণ ও মূল্যবোধকে কীভাবে প্রভাবিত করত। মঙ্গলকাব্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর

লোকভাষা ও সহজবোধ্যতা। এই কাব্যগুলি সাধারণ মানুষের জন্য রচিত ছিল, ফলে এতে ব্যবহৃত ভাষা ছিল সহজ ও সাবলীল। এর ফলে এই কাব্যগুলি দ্রুত লোকসমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। পালাগান, যাত্রা ও অন্যান্য লোকনাট্যের মাধ্যমে এই কাহিনিগুলি প্রচারিত হত, যা লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এছাড়া, মঙ্গলকাব্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ের একটি দিকও লক্ষ্য করা যায়। এখানে স্থানীয় লোকদেবতা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেব-দেবীর মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা দেখা যায়। এটি প্রমাণ করে যে, বাংলা সমাজে ধর্মীয় বহুত্ববাদ ও সহাবস্থানের একটি ঐতিহ্য ছিল। মনসা ও চণ্ডীর মতো দেবীরা মূলত লোকদেবী হলেও পরবর্তীকালে তারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ওঠেন, এটি ধর্মীয় সমন্বয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। পরিশেষে বলা যায়, 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যদ্বয় বাংলা লোকজ জীবনে ধর্ম ও মূল্যবোধের একটি গভীর ও বহুমাত্রিক চিত্র তুলে ধরেছে। এই কাব্যগুলি আমাদের জানায়, ধর্ম কেবল বিশ্বাসের বিষয় নয়, বরং এটি মানুষের জীবনযাত্রা, সামাজিক সম্পর্ক ও নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। লোকসাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাব্যগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা বাংলা সমাজের অতীত জীবনধারা, চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারি। তাই মঙ্গলকাব্যগুলি কেবল সাহিত্যিক রচনা নয়, বরং একটি সমাজের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের এক অমূল্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. চক্রবর্ত্তি, মুকুন্দরাম। কবিকঙ্কণ চণ্ডী। ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস, ১৯২১, কলকাতা।
২. চৌধুরী, শ্রীভূদেব। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম পর্যায়)। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, কলকাতা।
৩. দাস, ক্ষেমানন্দ। মনসামঙ্গল। বঙ্গবাসী ইলেক্‌ট্রো মেসিন প্রেস, ১৩১৬, কলকাতা।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড)। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২১, কলকাতা।
৫. ভট্টাচার্য্য, শ্রীআশুতোষ। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। কলিকাতা বুক হাউস, ১৩৪৬, কলকাতা।
৬. সেন, শ্রীসুকুমার। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)। আনন্দ, ২০১১, কলকাতা।
৭. হালদার, গোপাল। বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপ-রেখা (প্রথম খণ্ড)। বাণীশিল্প, ২০২২, কলকাতা।